কাঁঠাল কাঠের তক্তা

রতন শিকদার

কাঁঠাল গাছের বয়স যে ঠিক কত তা তার চেহারা দেখে আন্দাজ করা খুব কঠিন। বিশাল জটাজুট নিয়ে প্রায় বিঘা খানেক জমির ওপর তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কারও ধারণা এর বয়সের স্বর্ণজয়ন্তী হয়ে গেছে। কেউবা আরও একটু এগিয়ে হীরক বা প্লাটিনাম জয়ন্তীর কথা বলে। বয়স এর যাই হোক নিঃসন্দেহে এই গাছ দত্ত-বাড়ির প্রাচীনত্বের এক নিদর্শন। এই গাছের কৈশোর যৌবনের একমাত্র জীবিত সাক্ষী দত্ত-বাড়ির প্রাচীনতমা মহিলাটি। একানববই বছর বয়সের লোলচর্ম এই বৃদ্ধাটি যখন তার পক্ককেশ সম্বলিত মাথার ওপর আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে যৌবনের স্মৃতিচারণ করেন তখন কান টানলে মাথা আসার মত স্বাভাবিকভাবেই ওই কাঁঠাল গাছের কথা এসে পড়ে। ঠিক এ ভাবেই এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধা বিভাবতীদেবীর কাছে শুনেছে এই কাঁঠালগাছের সম্পর্কে কত কথা। এই কাঁঠাল গাছ দীর্ঘকাল ধরে কত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে আজও মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বড় আঘাত এর ওপর এসেছিল সাতাত্তরের আশ্বিন মাসে। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘন্টা ঝড়বৃষ্টিতে এর একটা অঙ্গহানি ঘটেছিল। একটা বিশাল ডাল ভেঙ্গে পড়েছিল। তিরিশ বছর আগের কথা হবের স্মৃতি বিভাবতীদেবীর মনে এখনও কোজাগরি পূর্ণিমার চাঁদের মত চকচক করছে। ঠিক এসময়ই বিভাবতীর ছেটি পুত্র এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে ভিন্ন সংসার পেতেছিল। এসব কথা বিভাবতী মাঝে মাঝেই শুনিয়েছেন। আর প্রতিবারই তার মনটা ভেজা ভেজা ঠেকেছে। সংসার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সে অবশ্য এই বসত বাড়ির ভাগ কোনদিন দাবি করেনি। তবে কর্তামশায় তাকে দক্ষিণের বিলের লাগোয়া সাড়ে চার বিঘা ডাঙ্গা জমি লিখে দিয়েছিলেন বিভাবতীর পরামর্শে। বলা যায় তার বিচক্ষণতার জন্যেই সে যাত্রা দত্ত-বাড়ি এবং তৎসংলগ্ন জমিজমা- গাছপালার ওপরে কোনও আঘাত পড়েনি।

কিন্তু এবারের সঙ্কট বেশ তীব্র। শুধু জমি-বাড়ি ভাগাভাগি নয়, কাঁঠাল গাছটাও রক্ষা পাবে না। ওটির অস্তিত্ব বিপন্ন। শরিকেরা সবাই সমান ভাগ বসাতে চায় ওই কাঁঠাল গাছে। কেউ চায় তক্তা সরাসরি আর কেউ পরিবর্তে মূল্য পেলেই খুশি। কর্তামশাই গত হবার পর তারবড় ছেলে হরিচরণই বর্তমান কর্তা। তিন পুত্র ও দুই কন্যার জনক হরিচরণ আজ এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। গত কয়েক দিনের সঙ্কটটা বঙ্গোপসাগরের ওপর ভেসে থাকা ঘূর্ণীঝড়ের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ঘনীভূত হওয়ার মত হয়ে দত্ত-বাড়ির ভাগ্যাকাশে অবস্থান করেছে। আর এর ফলে দত্ত-বাড়ির ওপরে বিশাল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিভাবতীদেবী তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হরিচরণকে ডেকে বললেন, 'হরি, এই দত্ত-বাড়ি প্রকৃতির অনেক রোষ সহ্য করেছে। আর মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে না?' হরিচরণ বরাবরই খুব শান্ত স্বভাবের। ছোট ভাই যখন আলাদা হয়ে গিয়েছিল তখনও তিনি নীরব ছিলেন। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে সবসময়ই খানিক যেন নির্লিপ্ত। বিভাবতীদেবী বিপর্যয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু তার ধারণা এতে বিপর্যয়ের কী আছে। তার ছেলেরা এখন স্বাধীন। যে যার নিজের উপার্জনেই সংসার চালায়। দত্ত-বাড়ির এজমালি সম্পত্তি থেকে যে আয় তার ওপরে তাদের অধিকার আছে ঠিকই। তবে সে আয়ের ওপরে তাদের নির্ভর করতে হয় না কোনওভাবেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন আয়ের সাথে স্বাধীনভাবে ব্যয় করে তাদের স্ত্রীপুত্র সবার মনেই স্বাধীনতাস্পৃহা খুবই জোরালোভাবে জেগে উঠেছে। ক্ষমতা থাকলে কে না চায় স্বাধীনতা?

হরিহরণ বা বিভাবতী বা হরিচরণের স্ত্রী হেমবালা কারোরই মনে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা স্থান পাচ্ছে না। দত্ত-বাড়ির কাঁঠাল গাছটা বছরের পর বছর কত ঝড়ঝাপটা সহ্য করে কত শত পাখপাখালিকে আশ্রয় যুগিয়ে গিয়েছে। সন্ধেবেলায় সব কটা পরিবারের সন্তান সন্ততি যখন তাদের কোটরগুলিতে ফিরে আসে তখন যে কোলাহলের সৃষ্টি হয় তা বিভাবতী উপভোগ করেন। বিভাবতী জানেন যে কোনও বৃহৎ পরিবারের সবাই একসাথে হলে অমন কোলাহল হওয়াটাইতো আনন্দেরই পরিচায়ক। দিনের শেষে তাদের পুনর্মিলনে যে আনন্দ বিভাবতী তা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেন। পাখিরাও তো স্বাধীন। তারাও তো যার যেদিকে ইচ্ছা উড়ে যায়। তাদের ডানায় তো কোনও বাধা নেই। কিন্তু তারাও কোনও এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে। তাই তো সন্ধ্যা নামতে না নামতেই সবাই ফিরে আসে ওই কাঁঠাল গাছটার কোটরে। বিভাবতীর প্রভাব হরিচরণের মধ্যে পুরো মাত্রায় আছে। তাই হরিচরণও উপভোগ করে পাখিদের ঘরে ফেরা আর হৈ হট্টগোল। বিভাবতীর মত হরিচরণেরও কাঁঠাল গাছটার প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ। হরিচরণ কল্পনাও করতে পারছে না কাঁঠাল গাছটার সম্ভাব্য পরিণতির কথা। ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে কয়েক কাঠা জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটাকে না কাটা হলে ও জমির তেমন দাম পাওয়া যাবে না। তাই জমি-বাড়ি ভাগ হওয়ার সাথে সাথে কাঁঠাল গাছটার সদ্‌গতি করতে হবে।

বিভাবতী দেবীর ব্যক্তিত্বের কাছে হেমবালা বরাবরই খানিকটা স্তিমিত। এ বাড়ির বউ হয়ে আসার প্রথম দিন থেকেই তিনি শাশুড়ির পদানত। কোনদিন কোনও ব্যাপারে তার স্বাধীন মত প্রকাশ করেননি। তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসো মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ তিনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক পক্ষীর পক্ষপুটে আশ্রিত পক্ষীশাবকের মত সারাটা জীবন আগলে রেখেছেন। অন্য দিকে তার সন্তানদের মুক্ত চিন্তায়, আধুনিক শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠার পেছনে ওর ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা। হেমবালা তার বাবা-মায়ের কাছে যুক্তিবাদের শিক্ষা পেয়েছিলেন আর তার নিজের ছেলেমেয়েদের মনেও সেই একই চিন্তাভাবনা একটু একটু করে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তবে সে শিক্ষার প্রয়োগ বাস্তব জীবনে তারা কতটা প্রয়োগ করেছে তা তার জানা নেই। হেমবালার শিক্ষাদান, তার নিজের বিশ্বাস আজ চরম একগ পরীক্ষার সম্মুখীন। আকাশের ঈশান কোণে একখন্ড কালো মেঘের আনাগোনা হেমবালার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু তার স্বভাবসুলভ শীতলতার কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ছে না। তবে এতদিন বাদে বড় ছেলে-ছেলের বৌ-মেয়েদের এবং নাতি-নাতনিদের কাছে পেয়ে যেন একটু উত্তেজিত।

বড় মেয়ে নন্দিনীর ছেলেটা কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে হেমবালার কাছে এল। ওর সারাটা শরীরে যেন উথাল-পাথাল সমুদ্রের ঢেউ — উঠছে আর ভ

াঙছে। শরীরের উপরিভাগ যদি সে ঢেউ এর চূড়া হয় তবে শরীরের নিম্নভাগ ভেঙ্গে পড়া ঢেউ। ছেলের পরনে রাফ এ্যান্ডটাফ জিন্স প্যান্ট আর ওপরে গে লগাল টি-শার্ট। এবার আই. সি. এস. ই.-র ফাইনাল দিয়েছে। ঠাকুমাকে অনেকদিন পর দেখে তার আনন্দ হয়েছে। চিৎকার করে উঠল, হাই ঠাম্মা। কী করছ?

হেমবালা বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকাখানা খুলে একাদশী কবে এবং কটার সময় লাগবে তা উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন। তার শাশুড়ি নিয়ম করে এক াদশী পালন করেন। বড় নাতির হাইহুই ডাকে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েও নাকের ডগা থেকে চশমাটা নামিয়ে বললেন, কীরে ব্যাটা, অমন হাই হাই করছিস কেন? ওটা কানে লাগিয়ে ধেই ধেই করে নাচলে আমার কথা আর শুনবি কী করে। বড় নাতি বব ততক্ষণে এ মঞ্চ ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেছে। আর ঠিক তখনই ছোট নাতি ডিঙ্গো ড্যাং ড্যাং করে চলে এল হেমবালার কাছে। তার বয়স বড়জোর বারো। ক্লাশ সিক্সে পড়ে। ইংলিশ মিডিয়াম। চোখে আতশ কাঁচের মত ভারি কাঁচের চশমা, হাতে ধরা টিন টিনের কমিক। ইংরাজিতে। ডিঙ্গো তার ঠাম্মার গলা জড়িয়ে বসে পড়ে বলল, কীসব বই পড়ছ ঠাম্মা? টিনটিন পড়। য া সব কান্ডকারখানা। তোমার ব্রেনই ব্র্যাশ করে যাবে। ওর ঠাম্মার অভিধানে এসব শব্দ নেই। তাই বলেন, কী ভাষায় যে তোরা কথা বলিস বাবা। কিচ্ছু বুঝি না। ডিঙ্গো উত্তর দেয়, তোমার আর বুঝে কাজ নেই। এসব ওয়াই টুকের ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি যাই দেখি ববদাকে একটু অয়লিং করি। ওয়াকম্যানটা ম্যানেজ করে মাইকেল জ্যাকসনটা শুনতে হবে।

হেমবালা একটুক্ষণ অবাক চোখে তার নাতিদের চলে যাওয়া দেখেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে আবার পঞ্জিকাতে মন দেন।

একটু আগে বিভাবতীদেবীর জারি করা সতর্কবাণী হরিচরণকে চিন্তিত করে তোলে। হরিচরণ ভাবেন, সত্যি কী অদ্ভুত সব ভাবনাচিন্তা ছেলে -মেয়েদের। অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারেন না তিনি। তাদের পদ্ধতি, বিন্যাস সব অন্য রকমের। তাদের যুক্তি তর্ক অন্য ধারার, অন্য ভাবনার। আর হবেই বা না কেন, ত ারা তো মুক্ত দুনিয়ার মানুষ। তাদের সময়ে তো বিশ্বব্যাপী মুক্ত হাওয়ার ঝড় বয়ে চলেছে। মুক্ত অর্থনীতি, মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত
মুক্ত দুনিয়া। তবে তাদের আর দোষ কোথায়?

বয়সের ভারে বিভাবতীদেবীর বোধশক্তি সামান্য কমে এলেও তার নাতি-নাতনি-নাতবৌ-তাদের ছেলে মেয়ে সবার সদলবল উপস্থিতি ওকে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাদের যুক্তিতর্কের জাল বিছানো দেখে তিনি চিন্তিত। বিভাবতী বেশ বুঝতে পারছেন তারা নাতি-নাতনিরা সব একপক্ষে। তারা পঞ্চরথীতে তাদের বাবাকে ব্যূহের মধ্যে ঠেসে ধরেছে। হরিচরণ কি পারবে সে ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে? বিভাবতীদেবী জানেন তার পুত্র তত বলীয় ান নয়। তাই তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন বলে বেরিয়ে এলেন। লাঠি ঠুক ঠুক করে বিভাবতী গিয়ে হাজির হলেন হরিচরণের ঘরে। সেখানে তখন যেন লোকসভার অধিবেশন চলছে। পুষ-মহিলা সদস্যরা একযোগে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্কে অংশ নিয়ে চলেছেন। বিভাবতীকে দেখে তারা সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, অঃ ঠাক্‌মা, তুমি আবার এখানে কেন? তুমি এসবের মধ্যে —। মানে তুমি এসব ঠিক বুঝবে না।

বিভাবতী দেবী শুধু একটা কথাই বললেন সকলকে উদ্দেশ্য করে, হ্যাঁরে বাঁদরের দল, আমি কী করে বুঝব তোদের লঙ্কাভাগের ব্যাপার-স্যাপার। আমি শুধু এটুকু বুঝি যে নৌকোর তলায় ছেঁদা হলে সে নৌকোয় করে সমুদ্দুর পাড়ি দেওয়া যায় না। আর সে ছেঁদায় জোড়া চলে না। দত্ত বাড়ির বজরাটায় তোরা ছেঁদা করে ফেলেছিস। তবু বলি, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ যদি জোড়া লাগাতে পারিস।'

বিভাবতীর কথা শুধু কথাই রয়ে গেল। কারও মনেই কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হল না। বিভাবতীকে যে বিষয়টা খুব বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হল ওই কাঁঠাল গাছটার অন্তিম অবস্থাটা। তার কৈশোরের সঙ্গী ওই গাছটার গতি কি হবে। ওই কাঁঠাল গাছ যে তার জীবনের সুখে-দুখে, মানে-অভিমানে, আনন্দে-নির ানন্দে জড়িয়ে আছে। সময়ে-অসময়ে, সুসময়ে-দুঃসময়ে বিভাবতী তার প্রাণের অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন ওই মূক সঙ্গীটির কাছে। কত রাতে তার ঘরের দাওয়া থেকেশ্বাস-প্রশ্বাসে কথা বলেছেন তার সাথে। সে কথোপকথনে কোনও বাক্য বিনিময় হয়নি, কোনও শব্দ সৃষ্টি হয়নি। শুধু ইথার তরঙ্গে প্রবাহিত হওয়া নিশ্বাসে ভাবের বিনিময় হয়েছে দুজনের মধ্যে। সেই কাঁঠাল গাছটিকে ভূমিতে লুটিয়ে দিতে চাইছে ওরা। তারপর তার দেহ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনাও করে ফেলেছে ওরা।

বড় নাতবৌ-এর ড্রেসিং টেবিল চাই। তার কাঠ আসবে ওই গাছের তক্তা থেকে। বড় নাতনির ছেলে ববকে আমেরিকায় পড়াশুনা করতে পাঠাবে তার বাবা ম া, গ্রাজুয়েশনের পর। সে বাবদ কিছু নগদ টাকা তারা তিন বছরের জন্য ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ করে রাখবে। সেই টাকাটা আসবে তার ভাগের তক্তা বিক্রি করে। ছে াট নাতনি বিশাখার দাবি রয়েছে কাঁঠাল গাছের ওপর। সে বাড়ি তুলছে সল্টলেকে, বাইপাশের ধারে। সে বাড়ির জানালা-দরজার পাল্লা বানাতে কাঠ লাগবে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার। ওই কাজটা সে বাড়ির কাঁঠাল গাছের তক্তা দিয়েই করতে চায়। তার বিশ্বাস ওই তক্তার মধ্যে তাদের নিজেদের বাড়ির স্মৃতিটা অন্তত বেঁচে থাকবে।

বিভাবতী দেবীর ছোট নাতি এখনও পড়াশুনা করছে। সে এরই মধ্যে দুটো বিষয়ে এম এ পাশ করেছে। চাকরি পায়নি। তাই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন কম্পিউটার না জানলে নাকি চাকরি পাওয়া যায় না। ও সেজন্য কম্পিউটার শিখছে, কলকাতার কলেজে। ওর অনেক দিনের সখ ভাল একটা পড়ার টেবিলের। কাঁঠাল কাঠের তক্তা তারও চাই। একটা পড়ার টেবিল আর একটা বই রাখার আলমারি তৈরি করাবে সে।

এতো গেল কাঁঠাল কাঠের তক্তার হিসাব। বাকি মেজো নাতি। সে তক্তা চায় না। তার ভাগের তক্তা বিক্রি করে টাকা পেলেই সে খুশি। অবশ্য উদবৃত্ত তক্তা বিক্রির টাকার ভাগও একেবারে হিসাব করে সমবন্টন করতে হবে সবার মধ্যে। অর্থাৎ কাঁঠাল গাছটার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন। বড় নাতবৌ-এর ড্রেসিং টেবিলের চাহিদা সত্ত্বেও বড় নাতি তার ঠাকুমার অনুভূতিটাকে সম্পূর্ণ গুত্ব দিয়েই বলতে চেয়েছিল কাঁঠাল গাছটা যেন অক্ষত থাকে। তাঁরা নিজেরা ওই প্র াচীন বৃক্ষটিকে হত্যা করতে যাবে না। পরে জমি বিক্রি হয়ে জমির নতুন মালিকের ইচ্ছানুসারে যা হবার তা হবে। তার কথা ঠাকুমার সেন্টিমেন্টটা সকলের বোঝা উচিত। গাছটার একটা ঐতিহ্য আছে। গান্ধীজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ঠাকুর্দারা ওই গাছের নিচ থেকে কত মিছিল বের করেছে। শুধু হেরিটেজের কথা মেনে কলকাতার কত বাড়ি কর্পোরেশন ভেঙে ফেলতে দিচ্ছে না।

বিভাবতী দেবী ঘরে ঢুকে চৌকিটার ওপর বসে সব শুনছিল। এক প্রস্থ সওয়াল জবাব হয়ে যাবার পর বললেন, বাবা হরি, তোর বড় ছেলে ঠিকই বলেছে। তুই ওদের জমি বাড়ি ভাগ করে লিখে পড়ে দে। কিন্তু কাঁঠাল গাছটাকে শেষ করতে দিস না। ওটার সাথে তোর বাবার যে কত সাধআহ্লাদ জড়ানো তা কি ওর া বুঝবে? পুরোনো জিনিসের প্রতি কি ওদের একটুও মায়া নেই? একটুও কি মমতা হয় না আমার সুখ দুঃখের সাথী ওই গাছটাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলতে? কী পাষন্ড বাবা আজকালকার ছেলে মেয়েরা।

হরিচরণ মায়ের ক্রোধ মিশ্রিত আদেশ-অনুরোধের উত্তরে বলল, মাগো আমি চাই না এ দৃশ্য ঘটুক। কিন্তু তোমার স্বাধীনচেতা নাতি-নাতনিরা না-ছোড়বান্দা। তারা তো কোনদিন বুঝতেই চাইল না দত্ত-বাড়ির এই ঐতিহ্য গড়ে তুলতে বাবা কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ওরা জানে না এ ঐতিহ্যের মর্যাদা কত। নিত্য অশান্তি আর ভাল লাগে না। তাই ওদের ইচ্ছে মতই সব হয়ে যাক মা।

অঞ্চলের বহু পুরোনো অভিজ্ঞ আমিন নগেন মন্ডলকে ডেকে আনা হল। জমি-জমা মাপা শেষ। উকিল ডেকে ভাগাভাগির ব্যাপারটাও একসময়ে মিটে গেল। কাঁঠাল গাছটি কাটা হবে। কে কী ভাগ পাবে সেই মত উকিলবাবু কাগজ পত্র দলিল সব তৈরি করিয়ে ফেললেন। বিভাবতী দেবীর পরামর্শে গৃহে পুরো

হিতকে ডাকিয়ে রেজিষ্ট্রির জন্য একটা শুভদিনও স্থির করে নিলেন হরিচরণ। তারপর নির্ধারিত দিনে বসিরহাটে সাবরেজিস্টারের অফিসে দলিল রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল।

এর পরের ঘটনাগুলো ঘটে গেল অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। দ্রপুর বাজার থেকে কাঠের বড় কারবারি দুর্গাদাস ঠাকুরকে ডাকিয়ে তার লোক লাগানো হল কাঁঠাল গাছটাকে কেটে টুকরো টুকরো করার জন্য। কাঠ চেরাই এর বড় বড় করাত এল। অতএব গাছটাকে কেটে তক্তা বানাতে ওদের প্রায় দিন পনেরো লেগে গেল। যারা তক্তার দাবিদার ছিল তাদের ভাগেরটা আলাদা করে রেখে বাকিটা নিয়ে দুর্গাদাস ঠাকুরের সাথে দর কষাকষি চলতে লাগল। দর কষাকষি যখন অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন সাক্ষাৎ যমদূতের মত কোর্টের পেয়াদা এসে হরিচরণের হাতে শমন ধরিয়ে দিল। কোর্ট আমেরিকান কোম্পানি জনসন ইনকরপোরেটেডের আবেদনের ভিত্তিতে ওই কাঁঠালের তক্তার বিলি বন্দোবস্তের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাদের দাবি অনুসারে সারা বিশ্বের কাঁঠাল গাছের ওপর তাদের পেটেন্ট। পেটেন্ট আইনের বিশেষ ধারা অনুযায়ী ওই গাছের সমস্ত তক্তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর কেবল মাত্র তাদের আইনগত অধিকার। এমন কী ওই তক্তার মূল্যও তারা নির্ধারণ করতে পারবে তাদের ইচ্ছা এবং তাদের দেশের আইন অনুসারে।

এ গল্পের শেষ হবে এক বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে —

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন ও আমাদের কাঁঠাল গাছ

মহামান্য আদালতের নির্দেশে নূতন আইন অনুসারে সমগ্র বিশ্ব কাঁঠালের বীজ নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিদেশী কোম্পানির উপর বর্তাইয়াছে। বাণিজ্যের বিস্তারণের প্রভাব আরও কতিপয় ভেষজের মানবহিতার্থে ব্যবহার ও প্রয়োগ স্বদেশের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র বিশ্ব ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছড়াইয়া যাইবে। আসুন আমরা সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রাচীন রীতিনীতির বিরোধিতা করি। উদারীকরণের জয় হোক। বিস্তারণের জয় হোক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে বর্তমান প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা তাহাদের পিতা-পিতামহদের ন্যায় কাঁঠালের রস পছন্দ করে না। ইহাদের এই প্রকারের দেশিয় খাদ্যবস্তুর প্রতি অনীহা দেখা যাইতেছে। প্রকারান্তরে বলা যায় ইহারা আমেরিকান চিপস-চিকেন মাঞ্চুরিয়ান ইত্যাদি আন্তর্জাতিক খাদ্যাদির প্রতি অধিক অনুরক্ত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com